OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 349 - 356
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 349 - 356
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

‘নবান্ন’ : সংকট মুহূর্তের দলিল

ড. সাগরিকা ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় (দূরশিক্ষা)
Email ID: sagarika@mail.vidyasagar.ac.in
0009-0007-5703-2459

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Colonial, Crisis, Depopulation, Devastation, Exploitation, Famine, Man-made, Peasant, Starvation.

Abstract
The present article examines Bijon Bhattacharya's acclaimed play Nabanna (1944) as a historical chronicle of Bengal during the crisis of 1940s, situating the text in the conjuncture of the Second World War (1939-45), the Quit India Movement of 1942, and the Bengal Famine of '50 [1350 B.S.]. Unlike the First World War, the Second World War directly affected India. As a British colony, India lived under the threat of a Japanese advance on its northeastern frontier. With Calcutta as the headquarters of the Allied eastern front, massive procurement of foodgrains for European and American troops, coupled with wartime inflation, inordinate hoarding, and rampant black-marketeering, led to a severe man-made crisis. So, besides such natural factors as flood and crop failure, the principal cause of the famine was man-made: an unwanted war thrust upon Indians, compounded by an anti-people colonial administration and its native collaborators like the jotedars, hoarders, and profiteers. The result was the devastation of the peasantry, the depopulation of villages like the play's fictional Aminpur, and the mass migration of destitute peasants to the city in quest of just few drops of rice gruel. While the first three acts of the play powerfully portray rapid disintegration and acute starvation, the final act's sudden turn to a joyous harvest festival seems to be a forced resolution. Drawing on Brechtian concepts of political theatre and Amartya Sen's analysis of famine as a failure of entitlement and distribution, the article questions how a landless peasantry could celebrate, locating this aesthetic weakness in its historical-political context – the Communist Party of India's adoption of the 'People's War Line' after the Soviet Union joined the Allies. As a Party whole-timer and leading playwright of the Indian People's Theatre Association, Bhattacharya was constrained from directly indicting British imperialism as the root cause. Endorsing Hiran Kumar Sanyal's observation (published in the journal Parichay) that the last scene is the weakest part of Nabanna, the article concludes that despite its ideological limitations and lack of a clear revolutionary formula, the play's return to human resilience continues to move the audiences. Its continued relevance, evidenced by recent translations such as Arjun Ghosh's (2018), secures its status as a historically significant document of colonial exploitations and peasant miseries.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 349 - 356
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

।। ১ ।।

আলোচনার আঙটপাতে সংকট শব্দের তিনটি উৎসের কথা উল্লেখ করব। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', *oxford Dictionary* এবং 'মহাভারতের বন পর্ব'। তিনটিক্ষেত্রেই কিন্তু সংকট শব্দটি বিশ্লেষণে যে অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে, তা হল বিঘ্নবহুল। আসলে নানান সংঘটনের ফলে যখন মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয় তখনই সংকটের সম্মুখীন হয় মানুষ। এই সংকট কখনোই হয় সামাজিক, কখনো রাজনৈতিক আবার কখনো বা প্রাকৃতিক।

ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখব উনিশ শতকের শেষ দু-আড়াই দশক থেকে বিশ শতকের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক পট পরিবর্তন খুব দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয়— বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০), মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯), লবণ আইন অমান্য (১৯৩০), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯), ভারতছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২), বাংলার দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩), তেভাগা, তেলেঙ্গানা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সংকট ইত্যাদি একের পর এক সংকটময় ঘটনা।

পৃথিবীকে রক্তাক্ত করে তুলেছে যখন সমগ্র চল্লিশের প্রায় প্রতিটি বছর, তখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অগস্ট আন্দোলন (১৯৪২) আরও একবার ভারতের মাটিকে কাঁপিয়ে তুলল। এদেশে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ হয়ে গেল ছিন্নমূল। না খেতে পেয়ে মরতে হল তাদের। অন্যদিকে আবার অর্থলোভী মহাজন মজুতদারদের করাল গ্রাস, সবমিলিয়ে এদেশে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে এক ভয়াবহ মন্বন্তর দেখা দিল। দাঙ্গা-বিধ্বস্ত মন্বন্তরের দুর্দশার প্রতিফলন ঘটল বাংলার সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে মায় শিল্পে। কেবল অন্নহীনতা নয়— তার পাশাপাশি চরম অত্যাচারের কাহিনি হয়ে উঠল সাহিত্য-শিল্পের মূল উপজীব্য। এই জাতীয় সংকট মুহূর্তের ছবি বিজন ভট্টাচার্যের প্রায় প্রতিটি নাটকেই প্রতিকায়িত হয়েছে, তবে এই প্রবন্ধে আলোচনা করব 'নবান্ন' নাটকটি নিয়ে।

।। ২ ।।

'নবান্ন'কে বোঝার আগে স্রষ্টাকে বোঝা প্রয়োজন। কেননা স্রষ্টাকে না বুঝলে আমরা তাঁর সৃষ্টির সঠিক মূল্যায়ন করতে পারব না। ১৯১৫ সালের ১৭ জুলাই পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলার খানখানাপুর গ্রামে জন্ম হয় বিজন ভট্টাচার্যের। বাবা ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য এবং মা সুবর্ণপ্রভা দেবী। বাবা ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক। তাঁর আদর্শ জীবনযাত্রা, সাহিত্য-সংগীত প্রীতি এবং শেক্সপিয়ার চর্চায় প্রভাবিত হয়েছিলেন বালক বিজন। তাই ১০ বছর বয়স থেকেই শেক্সপিয়রের লেখার অর্থ উপলব্ধি করার আগেই তিনি তা আবৃত্তি করতেন। পাশাপাশি সংগীতের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ। কৈশোর থেকেই গ্রামীণ সংস্কৃতি অর্থাৎ গ্রামের থিয়েটার, যাত্রা, কথকতা তাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছে, এমনকি তিনি তা অনুকরণও করেছেন। বাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনে মায়ের প্রভাবও ছিল অতুলনীয়। মা সুবর্ণপ্রভা দেবী ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সহোদরা। ১৯৩০-এ মেট্রিকুলেশন (জে. ডি হাই স্কুল, আড়বেলে) পাস করে বিজন যখন কলকাতাতে আসেন তখন সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর অভিভাবক। ১৯৩১-৩২ সাল নাগাদ আশুতোষ কলেজ ও রিপন কলেজে পড়াকালীন তিনি জাতীয় আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। মহিষবাথান লবণ আইন ভঙ্গেও অংশ নেন। স্বভাবতই বি.এ পড়াতে ছেদ পড়ে এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থানের পর ভারতবর্ষে সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণার প্রচারে তিনি আকৃষ্ট হন। এই সময়ে সাহচর্যে আসেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সরোজ দত্ত, বিনয় ঘোষ, অরুণ মিত্র, অনিল কাঞ্জিলাল, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রমুখ বিদ্বজ্জনের।

১৯৩৮-৩৯ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরি নিয়ে নানা ফিচার, সমালোচনা ইত্যাদি লিখতে থাকেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় থাকার সময়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির গুপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত হন। যুদ্ধের শুরুতে সত্যেন মজুমদারের 'অরণী' পত্রিকা প্রকাশিত হলে বিজন লিখতে শুরু করেন। ১৯৪০ থেকে 'অগ্রণী' পত্রিকাতেও বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। 'অগ্রণী'তে যে লেখাটি প্রথম প্রকাশ পায় সেটি একটি গল্প। গল্পটির নাম

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 349 - 356
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'জালসত্ব' (১৯৪০ ফেব্রুয়ারি)। এই সময়ে মার্কসবাদী রেবতী বর্মনের লেখা পড়ে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আসক্ত হন তিনি এবং সংস্পর্শে আসেন কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্ফর আহমেদের। ১৯৪২-৪৩ নাগাদ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। এমনকি আনন্দবাজার চাকরি ছেড়ে পার্টির হোলটাইমারও হন তিনি।

একটু খেয়াল করতে হয় সময়টা ১৯৪২। একদিকে ভারতছাড়ো আন্দোলন অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ফ্যাসিবাদের ভয়ংকর আগ্রাসী রূপ সারা বিশ্বে প্রকট হয়ে উঠেছে, সেই অস্থির পরিস্থিতিতে জনগণকে সক্রিয় করে তোলার জন্য ২৩ এপ্রিল ১৯৪২-এ পার্টির স্মারকলিপিতে দেশের সর্বত্র ফ্যাসীবিরোধী কার্টুন, পোস্টার প্রদর্শনী, নাচ-গান ও নাট্যানুষ্ঠান করার কথা বলা হয়েছিল।

১৯৪২ সালে 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' স্থাপিত হলে বিজন ভট্টাচার্য এই সংগঠনের কাজ কর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। ১৯৪৩ সালে ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। গবেষক বিনয় ঘোষ তাঁকে প্রথমে ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে পরে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘের' সঙ্গে পরিচয় করান। এই সময়ে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাটিকা লেখার জন্য পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছিল। সাড়া পেয়ে ফ্যাসি বিরোধী তরুণ লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার চালানো হয় নাটক লেখার জন্য। তখনই বিজন লিখেছিলেন একাঙ্ক নাটক 'আগুন' (১৯৪৩)। এরপর থেকেই একের পর এক প্রকাশ পায় তাঁর রচিত নাটক। একথা সকলেরই জানা যে, তাঁর লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'নবান্ন' (১৯৪৪)।

।। ৩।।

বিশ শতকের চল্লিশের দশক সমগ্রবিশ্বের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি ভারতবর্ষ তথা বাংলার ক্ষেত্রেও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে এনেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত আর ভারতবর্ষে কিংবা বাংলায় পরোক্ষভাবে থাকলো না, একেবারে প্রত্যক্ষ রূপে দেখা দিল। ১৯৪২-এর অগস্ট আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ বিপ্লব সমগ্র দেশকে উত্তাল করে তুলেছিল। সেই সঙ্গে আমরা সকলে জানি ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে এবং অবসানকালে দুটি মন্বন্তরের কথা— একটি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আর অপরটি পঞ্চাশের মন্বন্তর। যা ভারতের ইতিহাসে কেবল ঐতিহাসিক নয় এক কলঙ্কজনক ঐতিহাসিক ঘটনা, জনবিরোধী সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল লোভী, কুচক্রী কিছু মানুষ— জোতদার, মজুতদার, কালোবাজারি, মুনাফালোভী রূপে যারা চিহ্নিত। হঠাৎ দেখা গেল রাতারাতি চাল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু উধাও হয়ে গেল। ফলে নিম্নবিত্ত ও সঞ্চয় সম্বলহীন কৃষক সমাজ সর্বনাশের মুখে পড়ল। আমিনপুরের মত (যে গ্রামটি ঘিরে 'নবান্ন' নাটক আবর্তিত) গ্রামের পর গ্রাম শ্মশান ভূমিতে পরিণত হল। গ্রামের মাটি ছেড়ে দলের পর দল কৃষক শহরের দিকে পাড়ি দিল। রিক্ত বুভুক্ষু মানুষের কাতর কণ্ঠে ফ্যান চাওয়ার কথা শোনা গেল। গঙ্গাপদ বসু তাঁর 'নবান্নের স্মৃতি' প্রবন্ধে মন্বন্তরের এই বাস্তব চিত্রটি অসাধারণভাবে ব্যক্ত করেছেন। মূলত বন্যা, মন্বন্তর এবং আগস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে ঘিরে 'নবান্ন' নাটকের কাহিনি এগিয়েছে। কাহিনির বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। তবে একটা ফ্রেম আউট না করে দিলে আমার আলোচনার মূল লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না।

'নবান্ন' নাটকের চারটি অঙ্ক এবং মোট ১৫টি দৃশ্য। এর মধ্যে নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি কিন্তু মূল কাহিনি থেকে বিচ্ছিন্ন। এটি একটি প্রাক্-পটভূমিরূপে যেন চিহ্নিত। ১৯৪২-এর অভয়া সংগ্রামী নারী মাতঙ্গিনী হাজরার আভাস পাওয়া যায় পঞ্চাননীর মধ্যে। যিনি 'এগিয়ে যা, এগিয়ে যা' বলতে বলতে গুলিবিদ্ধ হচ্ছেন এবং প্রাণ হারাচ্ছেন। এই প্রথম দৃশ্য যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ একাঙ্ক নাটক। প্রথম দৃশ্যের চরিত্রগুলি দ্বিতীয় দৃশ্যে আছে বটে কিন্তু তা ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন পটভূমিতে এবং পরিবর্তিত চেহারায়। এই দ্বিতীয় দৃশ্য থেকেই কিন্তু মূল নাটকটির সূত্রপাত ঘটেছে। ইতিহাসের প্রামান্য তথ্যপঞ্জির সঙ্গে 'নবান্নের' তথ্যপঞ্জি মিলিয়ে নেওয়া যায়—

> "বাংলার যুদ্ধের অভিঘাতে বিপজ্জনক অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া ঘটে। প্রথমত, সৈনিক ও উদ্বাস্তুতে প্রদেশ ভরে যায়। ...১৯৪২-এর মার্চে দেখা যায়, প্রতিদিন ২,০০০ থেকে ৩,০০০ উদ্বাস্তু চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় আসছে। ...দ্বিতীয় একটি অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয় যখন সামরিক প্রকল্পগুলিতে উচ্চ বেতনে শ্রমিকদের চাহিদা সৃষ্টি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 349 - 356
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> হলেও প্রতিরক্ষা নীতির পরিণামে কৃষকেরা কর্মচ্যুত হতে থাকে। এই প্রবণতা প্রকটতম দৃষ্টান্ত 'নৌকা বিরোধ পরিকল্পনা'। নিম্ন বদ্বীপের পথে বাংলায় জাপানি অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় ১৯৪২-এর মে মাসে এই পরিকল্পনা চালু হয়। ...উনশশো বিয়াল্লিশে রাজনৈতিক আন্দোলনও তীব্রতর হয়।... মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও কাঁথি সাবডিভিশনে আন্দোলন বিশেষভাবেই জঙ্গি রূপ পরিগ্রহ করে।... বিদেশি আক্রমণের আঘাতস্থল হতে পারে এমন একটি অঞ্চলে এই বিপ্লব বাংলার সরকার সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। ১৯৪২ এর অক্টোবরে বিপ্লবীদের দমন করতে সৈন্যবাহিনী, পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর ইউনিট এই অঞ্চলে নেমে পড়ে। ব্যাপক হারে গ্রেপ্তার করা হয়।... ১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবর এক সাইক্লোন ও আনুষঙ্গিক বান পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর ওড়িশার সমগ্র তটভূমি জুড়ে আছড়ে পড়লে মেদিনীপুর ও কাছাকাছি জেলাগুলিতে যে ক্ষতি হয়, তার পাশে রাজনীতি ম্লান হয়ে যায়।"[১]

'নবান্ন' নাটকে বিজন ভট্টাচার্য এই কাহিনি পরম্পরা অনুসরণ করেছেন। মূল নাটকটি শুরু হয়েছে অভাব দিয়ে। এরপরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভেঙে পড়েছে মানুষের মাথা গোজার আস্তানাটুকুও। এমনকি বন্যায় ভেসে যায় দয়ালের বাড়ি-স্ত্রী-আত্মীয় পরিজন— সবাই। প্রধানকে বলতে শুনি—

> "প্রধান : থাকবার মধ্যে ঘরখানাই ছিল, গেল! গেল! পথে নেমে দাঁড়াবারও তর সইল না রে কুঞ্জ, পথই ঘরে উঠে এলো। ঘর বার সব একাকার হয়ে গেল। ও কুঞ্জ তোর কথাই সত্যি, তোর কথাই সত্যি হল। প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে। কুঞ্জ তুই যে বলেছিলি—
>
> [নেপথ্যে কুঞ্জ কুঞ্জ ডাক]
>
> কুঞ্জ : (উৎকর্ণ হয়ে) য়্যা...কুঞ্জ! ...কে?
>
> (উন্মত্ত অবস্থায় দয়ালের প্রবেশ)
>
> দয়াল : কুঞ্জ, কুঞ্জ, কুঞ্জ!
>
> কুঞ্জ : দয়াল দা! কি হয়েছে দয়ালদা?
>
> দয়াল : (কোঁচড়ের চাল হাতে নিয়ে) এই যে কুঞ্জ, তোর, তোর সেই চাল ক'টা। তোর সেই চাল ক'টা।
>
> কুঞ্জ : (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) দয়ালদা, দয়ালদা!
>
> দয়াল : (স্বপ্নোত্থিতের মতো) য়্যা, কোন কিছু ছিল নাকি আমার কোনদিন? ছিল কি কেউ। কোথায় গেল! আমার কি কিছু ছিল না!
>
> কুঞ্জ : রাঙার মায়ের জন্য যে তুমি—
>
> দয়াল: রাঙার মা কোথায় গেল রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙা! আমার ঘর, কোথায় গেল আমার ঘর!
>
> কুঞ্জ!!
>
> প্রধান : দয়াল!
>
> দয়াল : প্রধান, সমুদ্দুর, চারিদিকে শুধু সমদ্দুর, —জল আর জল, কিছু নেই, শুধু জল...সমুদ্দুর উঠে এসেছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা! রাঙার মা!"[২]

খুব স্বাভাবিকভাবে তীব্রতর হয় অন্নের হাহাকার, কুঞ্জের আদরের শিশুসন্তান মাখনকে বলতে শোনা যায়—

> "মাখন : আমার খিদে। আমি খাব। আমায় খেতে দে। আমি খাব।
>
> প্রধান : আমি ভুলতে পারবো না, আমারে কেউ ভুলোতে পারবেনা যে সুদ্ধু না খেতে পেয়ে—
>
> কুঞ্জ: জেঠা, ওর অসুখ। তুমি ভুল করছ জেঠা। ওর ভয়ানক অসুখ। ডাক্তার বলছে ওর ভয়ানক অসুখ।
>
> মাখন : আমার খিদে, আমি খাবো, আমার খিদে—
>
> প্রধান : আমারে কেউ ভুলোতে পারবে না। ডাক্তার যাই বলুক আমি ভুলবো না, আমারে কেউ ভুলোতে পারবে না—
>
> কুঞ্জ : তুমি বুঝতে পারছ না জেঠা, ওর ভয়ানক অসুখ—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 349 - 356
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রধান : আমি ভুলবো না যে সুদ্ধু না খেতে পেয়ে ছেলেটা মরে গেল।

—আমারে কেউ ভুলতে পারবে না—"[৩]

এবং এই অঙ্কের শেষে দেখা যাচ্ছে সত্যিই মাখন না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। বাইরে যে মৃত্যুর কলরব পড়েছিল (একটু আগে দেখলাম দয়ালের স্ত্রী সন্তান সবাই মারা গিয়েছে) তা ঢুকে পড়লো প্রধানের পরিবারে। দ্বিতীয় অঙ্কের শোষণ আরো বিভৎসরূপ নেয়। একদিকে কালীধন ধাড়ার চালের গুদামে হাজার হাজার মন চালের কালোবাজারি, অন্যদিকে প্রধান সমাদ্দার ও তার পরিবারের সকলকে কলকাতার পথে ভিক্ষুকের দলে মিশে যেতে দেখা যায়। এমন অর্থনৈতিক সংকটের সময় এই ভিক্ষুকদেরকে উদ্দেশ্য করে দুই ফটোগ্রাফারের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বিজন ভট্টাচার্য সমাজের স্বার্থসন্ধানী মানুষের চেহারাকেই যে ব্যক্ত করেছেন তা নয়, একেই সঙ্গে প্রতিভাত হয়েছে মিডিয়া সংকটও।

"১ম ফটোগ্রাফার ক্যামেরা তাগ করতে করতে বলছেন— মুখার্জি!

২য় ফটোগ্রাফার : য়্যা

১ম ফটোগ্রাফার : একটু হাসি ফোটাতে পারো হাসি জাস্ট এ বিট অব স্মাইল। দেখো না ভাই একটু চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় ফটোগ্রাফার : হাসি!

প্রথম ফটোগ্রাফার: হ্যাঁ, হ্যাঁ ছবিখানার তাহলে নাম দিতে পারি বাংলার ম্যাডোনা।

দ্বিতীয় ফটোগ্রাফার : দি আইডিয়া, কাগজের সার্কুলেশন তা হলে তো কাল দ্বিগুণ হে। ওঃ, 'বস্' যা খুশি হবে তোমার ওপর মাইরি!"[৪]

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ' কবিতার কথা। যেখানে কবি বলেছিলেন যে, 'হেথায় সুলভ নহে হাসি'। আসলে নিরন্ন মানুষগুলির প্রতি চরম উদাসীনতার জন্যই সন্তানকোলে অন্নবস্ত্রহীন ভিখারিনীর ছবি তুলে 'বাংলার ম্যাডনা' নাম দিয়ে কাগজে ছাপাতে চায় বা প্রধানকে পয়সা দিয়ে 'কঙ্কালের ছবি' তুলতে চায়। এই দৃশ্যেই বিনোদিনী কলকাতার ভদ্রবেশী টাউটের হাতে পরে বিক্রি হয়ে যায় নারী লোলুপ মানুষের কাছে।

এইরকম ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন বাংলা, তখন একটি বিয়ে বাড়িতে ১০০০ জন মানুষের নিমন্ত্রণ এবং ব্ল্যাক মার্কেটের কৃপায় অনেক বেশি অর্থ দিয়ে 'এক রাজসিক' ব্যাপার চলছে সেখানে, পাশাপাশি ওই জায়গায় দেখা যাচ্ছে নিরন্ন কুঞ্জ ডাস্টবিন ঘেঁটে খাবার আনতে গিয়ে অভুক্ত কুকুরের কামড় খাচ্ছে। আর প্রধান সমাদ্দার রাস্তায় দাঁড়িয়ে তারস্বরে চিৎকার করে প্রার্থনা জানাচ্ছে দুটি ভাতের জন্য—

"কুকুরটা গর্জে উঠে যেন কাউকে কামড়ে দিল মনে হয় আর্তনাদ শুনে। দেখা যায় কুঞ্জ তার ক্ষতবিক্ষত হাতখানা তুলে ধরে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

প্রধান : (অন্ধকারের ভেতর থেকে) দুটো খেতে দাও বাবু। ও বাবারা...

রাধি : ওমা— একেবারে কামড়ে খেলে গো!

(রাধিকা কুঞ্জের দিকে ছুটে যায়, ডাস্টবিনের কাছ থেকে)

রাধিকা : (কুকুরের প্রতি) ভারী পাজি কুকুর তো। কামড়ে দিলো গা! (কুকুরকে) দূর হারামজাদা, লক্ষ্মীছাড়া কুকুর। ঝাঁটা মারো মুখে ঝাঁটা মারো। ছাই খা, ছাই খা। দূর—থু—থু—

(আক্রোশের থুতু ছিটোতে থাকে। নেপথ্যে কুকুরের গোঙ্গানি শোনা যায়)

ওমা এই যে অনেকখানি কামড়ে দিয়ে নিয়েছে দেখছি। ওমা আমার কি হবে গো। ইস-স-স— (ত্রস্তে পরনের কাপড়টা ছিঁড়ে এক ফালি ন্যাকড়া বার করে বেঁধে দেয় কুঞ্জের হাতে)।"[৫]

অর্থাৎ সমান্তরাল দুটি চিত্র দর্শক-পাঠকের সামনে তুলে ধরলেন নাট্যকার। দুটিই সংকট— প্রথমটি মানবিক আর দ্বিতীয়টি অর্থনৈতিক।

এরপরের ঘটনা আমিনপুরে। লোভী, জমি অপহরণকারী ব্যবসায়ী হারু দত্তের কদর্য রূপটি উন্মোচিত হয়েছে এই দৃশ্যে। অর্থের অভাবে দরিদ্র চাষী চন্দর, যুবতী মেয়েকে বিক্রি করে হারু দত্তের কাছে। কান্নায় ফেটে পড়ে সে বলে—

"চন্দর : মেয়ে বিক্রি করলাম আমি। মাতিরে আমি বেঁচে ফেললাম। (কেঁদে ফেলে) মাতি, আমার মা...।"[৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 349 - 356
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পরবর্তী দৃশ্য কালীধন ধাড়ার সেবাশ্রম। এই সেবাশ্রমে নিরঞ্জন ওরফে রাসবিহারী খুঁজে পায় তার স্ত্রী বিনোদিনীকে। যে দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে তার পরিজনদের কাছ থেকে ছিটকে গিয়েছিল বহু দূরে। কালীধন ধাড়া ধর্মশালার সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে নারী ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন আর হারু দত্ত গ্রাম থেকে অসহায় মেয়েদের নানারকম লোভ দেখিয়ে এখানে নিয়ে আসতেন। এও আরেক ধরনের সংকট তো বটেই।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথমেই নাট্যকার স্পষ্ট করেছেন গ্রামের মানুষগুলি যে আশা নিয়ে শহরে এসেছিল তাতে মোহভঙ্গ ঘটেছে এবং এই অঙ্কে সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রকে ব্যঙ্গও করা হয়েছে। সেই সঙ্গে শাসক শ্রেণির শোষণ, দরিদ্র মানুষের জীবন যন্ত্রণাকে যে কত তীব্র করে তুলতে পারে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে প্রধানের অসংলগ্ন কথায়। প্রধান বলে—

> "প্রধান : (বোকার মতো) ব্যথা নেই?
> ডাক্তার : না ব্যথা নেই, কিচ্ছু নেই। ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা।
> প্রধান : (হঠাৎ নোংরা জামা কাপড় আর আবর্জনা গুলো জোরে, আঁকড়ে ধরে, সোজা হয়ে দাঁড়ায়)
> তাই ভালো। ভুলে যাও। ভুলে যাও ব্যথার কথা! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। ভুলে যাও।"[৭]

নবান্নের শেষ অঙ্ক অর্থাৎ চতুর্থ অঙ্ক দীর্ঘ এবং অতি সরলীকৃত। দেখানো হয়েছে গ্রামের মানুষ গ্রামে ফিরে আসছে। নবান্নের শুরুতে আমরা যে দেখেছি, অভাব-দারিদ্র্য এবং অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানহীনতার কারণে গ্রামের মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়েছে— এই কাহিনি তো নতুন নয়। ১৭৭০ সালে অলিভার গোল্ড স্মিথ এই প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে লিখেছিলেন 'দি ডেজার্টেড ভিলেজ'। ১৮৪০-এ চার্লস ডিকেন্সের 'হার্ড টাইম' উপন্যাসও এই কাহিনি নির্ভর। তাহলে বিজন ভট্টাচার্য নতুন কী দেখালেন? এই যে তিনি এত সমস্যার উদ্ঘাটন করলেন তিন অঙ্ক জুড়ে— চতুর্থ অঙ্কে এসে আমরা কী দেখতে চেয়েছিলাম আর কী দেখলাম? এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্য বড়ই শ্লথ এবং দ্বিতীয় দৃশ্য শুরু হচ্ছে মেয়েদের হাসি উজ্জ্বলতার মধ্য দিয়ে আর প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে নাটক শেষ হচ্ছে।

> "দয়াল : আজ আমাদের নবান্নের উৎসব, প্রধান।
> প্রধান : নবান্নের উৎসব। ভালো, ভালো, নবান্ন ভালো, সুদিন গড়েছে সব! দুঃখের দিন সব কেটে গেছে। কেটে গেছে সব দুঃখের দিন। আর আসবে না!"[৮]

।। ৪।।

নাটকের প্রথম তিনটি অঙ্কে যে সংকটের ছবি বিজন ভট্টাচার্য আমাদের সামনে তুলে ধরলেন শেষঅঙ্কে গিয়ে এই যে প্রবল আনন্দ উৎসবে মেতে উঠল গ্রামবাসী, এখানে কোথায় যেন হঠাৎ করে সমাধান দেখাতে চাইলেন বিজন। যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাধান আমরা আশা করেছিলাম তাঁর কাছ থেকে— তা কিন্তু তিনি সেই অর্থে দেখাতে পারলেন না। সমাধানটাকে তিনি ছেড়ে দিলেন *nature*-এর (প্রকৃতি) ওপরে। যে সমস্যার তিনি অবতারণা করলেন, *logic*-এর ভাষায় যাকে বলে *premise,* সেই *premise*-এর সমাধান কী এটা? এই দুর্ভিক্ষ ছিল যতটা প্রাকৃতিক তার থেকে অনেক বেশি 'man made crisis'। বাংলা তখন আন্দোলনের পিঠস্থান। তখন অগস্ট আন্দোলন হচ্ছে। বাংলার এই বিপ্লবের মেরুদণ্ডকে ভাঙার জন্য খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে না। যেটা অমর্ত্য সেনের *welfare economy*-র মূল কথা যে—পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে আর খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। তারা কিন্তু এই দুটোর কোনটাই করছে না। আর সাধারণ মানুষ ভাবছে— এই যে ঝড়-বন্যার কারনে যে বিপর্যয় ঘটলো তারই পরিণাম স্বরূপ ভালো ফসল হল না বলেই দুর্ভিক্ষ হল। সাধারণ মানুষ তো এর থেকে বেশি কিছু ভাবতে পারছেন না! কিন্তু আমরা ব্রেখট্-এর নাটকগুলোতে দেখি যে মানুষকে সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবগত করা। অর্থাৎ *economic, social, political* কারণ গুলোকে সকলের সম্মুখে তুলে ধরা। আসলে 'নবান্ন'-এর *idea*-টাই ধাক্কা দেয়, যে উৎসব করছে সাধারণ মানুষ! সমস্যাটা তাহলে গেল কোথায়? তার কী সমাধান হবে? সব থেকে বড় কথা যে, উৎসব হবে কী করে? তাদের তো সেই অর্থে জমিই নেই। এই প্রসঙ্গে সার্ত্রের 'এগজিস্টেনসিয়ালিজম্'-এর কথা বলতে হয়। তার যে মূল কথাটি, সেটি তো মার্ক্সদের কাছ থেকেই নেওয়া— বিপ্লবের মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার কোন সূত্রই কিন্তু নাটকটির শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 349 - 356
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আসলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে সোভিয়েত মিত্র শর্ত মেনেছিল। হিটলার আক্রান্ত সোভিয়েত ছিল ব্রিটেন আমেরিকার মিত্রশক্তির পক্ষে। সেই মিত্রশক্তি ব্রিটেনকে কোন মতেই বিব্রত করা যাবে না, এই নীতিই ঘোষিত হলো 'জনযুদ্ধ লাইন' হিসাবে।

পার্টি কর্মীদের মধ্যে এই 'জনযুদ্ধ লাইন' নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। বিজন ভট্টাচার্য তখন কমিউনিস্ট পার্টির হোলটাইমার। তাঁকেও ভাবতে হয়েছিল এই 'জনযুদ্ধ লাইন' নিয়ে। তাই বোধহয় গণনাট্য সংঘের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটককার বিজন ভট্টাচার্যকে এই পার্টি নিয়ন্ত্রণের বাধ্যবাধকতায় বেঁধে রাখা হয়েছিল। তাই নাটকে ব্রিটিশ রাজত্বের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণকে মন্বন্তরের মূল কারন হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেননি তিনি। অর্থাৎ *man-made crisis* -কে সেই অর্থে গুরুত্ব দিতে পারেননি।

'পরিচয়' পত্রিকাতে হিরণকুমার সান্যাল মন্তব্য করেছিলেন— "নবান্নের দুর্বলতম অংশ শেষ দৃশ্য।" সেই মন্তব্যকে সমর্থন জানিয়েও শেষ করব এই কথা বলে যে, 'নবান্ন' নাটকে মার্ক্সিস্ট সংগ্রামকে তেমনভাবে না পাওয়া গেলেও নাটকের শেষে মানুষের যে স্বাভাবিকতায় উপনীত হওয়াকে দেখানো হয়েছে, তা দর্শকের হৃদয়কে ছুঁয়ে গেছে। এই ইতিবাচক জায়গা থেকেই 'নবান্ন' আজও ঐতিহাসিক গুরুত্ববাহী একটি উল্লেখযোগ্য নাটক এবং সংকট মুহূর্তের দলিল। তাই তো ২০১৮-তে এসেও আমরা অর্জুন ঘোষের হাতে 'নবান্ন'-এর অনুবাদ পাচ্ছি।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, বিজন : নবান্ন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, জানুআরি ২০০৪, পৃ. ১৪-১৫
২. ভট্টাচার্য, বিজন : নবান্ন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, জানুআরি ২০০৪, পৃ. ৫০
৩. ঐ, পৃ. ৫৩
৪. ঐ, পৃ. ৭০
৫. ঐ, পৃ. ৭৭
৬. ঐ, পৃ. ৮১
৭. ঐ, পৃ. ৯৮
৮. ঐ, পৃ. ১১৯

Bibliography:

আকর গ্রন্থ:

ভট্টাচার্য বিজন, রচনা সংগ্রহ (১), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ২০০৮

সহায়ক গ্রন্থ:

বাংলা গ্রন্থ:

গুপ্ত দেবনারায়ণ : বাংলার নটনটী, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬
চন্দ্র বিপান : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৮৫৭-১৯৪৭), কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ২০১৪
বসু বিষ্ণু : বঙ্গীয় নাট্যশালা, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, কলকাতা, মাঘ, ১৪০৪
ভট্টাচার্য আশুতোষ : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড), এ. মুখার্জি অ্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৪

পত্র-পত্রিকা পঞ্জি:

নাট্যচিন্তা : বিজন ভট্টাচার্য জন্মশতবর্ষ' (সংখ্যা: ১-৬), সম্পাদক : রথীন চক্রবর্তী, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৫ - এপ্রিল ২০১৬

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 349 - 356
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বহুরূপী পত্রিকা, সংখ্যা ৬৯, সম্পাদক : কুমার রায়, কলকাতা, মে ১৯৮৮
বহুরূপী পত্রিকা, সংখ্যা ৭০, সম্পাদক : কুমার রায়, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৮৮